মুর্তজা বশীরের দায়বদ্ধতার শিল্প

মো. বনি আদম*

[**সারসংক্ষেপ:** সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে একজন শিল্পীর দায় থেকে যায় তার সমাজের প্রতি। সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে শিল্পকর্মে। প্রত্যেক শিল্পীই একটি সময়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে অতিক্রম করে; ফলে তার শিল্পকর্মে ধরা থাকে সময়ের চালচিত্র। মুর্তজা বশীর সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ একজন শিল্পী— এ বিষয়টি তাঁর শিল্পকর্মের ভাষায় স্পষ্ট। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পর্বে মুর্তজা বশীরের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি তাঁর চিত্রকর্মে বাঙালির লড়াই আর সংগ্রামশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে। এ চিত্রগুলোতে পাওয়া যায় সে-সময়ের জনচিত্তের পরিচয়। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও তাঁর শিল্পকর্মে সে-ধারার প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। তাঁর শিল্পকর্মে ধরা দিয়েছে সমাজের মানসভাবনা, যুগযন্ত্রণার কথা। এ প্রবন্ধে মুর্তজা বশীরের সেসমস্ত শিল্পকর্ম নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যেখানে শিল্পীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটি স্পষ্ট।]

'সমাজ সচেতন না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিল্পী সত্যিকার অর্থে মহৎ হতে পারে না' (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৮৩)— একথা যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি শিল্পী মুর্তজা বশীর। তাঁর শিল্পকর্মেও এ কথার পরিচয় মেলে। তিনি একাধারে মূর্ত ও বিমূর্ত ধারার শিল্পী। তাঁর ক্যানভাস সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথামালায়। তাঁর বিদেশে অধ্যয়ন পর্বের চিত্রেও প্রধান উপজীব্য হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন; এর পেছনে রয়েছে মানুষ তথা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। রাজনীতি-সচেতন এ শিল্পী বাঙালির ভাষা-আন্দোলনে, স্বাধিকার আন্দোলনে যেমন সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন; তেমনি উচ্চকিত ছিল তাঁর তুলির ভাষা, প্রতিবাদী শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে মিটিয়েছেন শিল্পের দায়। রাজনীতি-সচেতনতার কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে তাঁর ছবির মূল উপজীব্য। (ঢালী, ২০০৭: ৩৬৭)। জীবনের নানা বাঁকে তাঁর ছবির আঙ্গিকের পরিবর্তন হলেও শেষ অবধি সমাজজীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি থেকেই যায় তাঁর সৃষ্টকর্মের মাঝে।

মুর্তজা বশীরের শিল্পশিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনে মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। তিনি স্কুল জীবনেই জড়িয়ে পড়েন বামধারার রাজনীতির সাথে। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের জন্য মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের ছবি আঁকতেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন মুর্তজা বশীরের আঁকা ছবির প্রশংসা করে তাঁর অটোগ্রাফ বইতে লিখলেন— 'আর্টিস্টের কাজ হলো শোষিত জনগণের ভাব ও দুঃখ-দুর্দশাকে চিত্রের ভেতর দিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যাতে সমাজে সে আর্ট নবজীবন

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.3

সৃষ্টি করতে পারে।' (হাসনাত, ২০০৪: ২৪; মুর্তজা, ২০১৮: ৯৬)। কিশোর ভবানী সেনের বাণীতে তিনি আরো বেশি আলোড়িত হন এবং বামপন্থী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রেরণা লাভ করেন।

মুর্তজা বশীর ঢাকা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলেন ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে; শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের বামধারার রাজনৈতিক আদর্শে সংগঠিত করার লক্ষ্যে। শিল্পীর নিজের ভাষায়— 'আর্ট পড়াটা হয়েছিল ঘটনাচক্রে। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পোস্টার লিখতাম, আবার পার্টি অফিসের জন্য আঁকতাম মার্কস, লেনিন কিংবা স্টালিনের প্রতিকৃতি। তাই সেই রাজনৈতিক সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমার প্রতি নির্দেশ হলো আর্ট কলেজে ঢুকে পড়ার, ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার।' (মুর্তজা, ২০১৪: ১২১)। ভর্তির পরের বছর ১৯৫০ সালে পার্টির পোস্টার আঁকতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন, জেল হয় পাঁচ মাসের (মতিউর, ২০১৪: ১৭৪)। এভাবে সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বিকশিত হয় তাঁর শিল্পচেতনা, সৃষ্টি হতে থাকে শিল্পানুরাগ।

এদিকে ভাষার দাবিতে তৎকালীন পূর্ববাংলায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এদেশের ছাত্রসমাজ। ঢাকার সর্বত্র দেয়াল লিখে, পোস্টার এঁকে আন্দোলনের চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন এদেশের চারুশিল্পীরা। এ আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন মুর্তজা বশীর। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ব্যক্তি মুর্তজা বশীর সম্পর্কে জানা যায় শিল্পী কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে— 'তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি, শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়লো। সালাম, বরকতদের সংবাদ আমি বশীরের কাছ থেকে প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত এবং মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত।' (কামরুল, ২০১০: ৩৪; মাহমুদ, ২০১৩: ১৩০)।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদী বাঙালিকে মেলে ধরেন শিল্পী মুর্তজা বশীর তাঁর *রক্তাক্ত একুশে* চিত্রকর্মে (চিত্র: ০১)। লিনোকাট মাধ্যমের সাদা-কালো ছাপচিত্রটি ভাষা আন্দোলনের একমাত্র শিল্পকর্ম যা ১৯৫২ সালের জীবন্ত দলিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মিছিল-ব্যানার-ফেস্টুনে ওঠে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি। এদিন পূর্ব থেকে জারিকৃত ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্ররা মিছিল করলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়, শহিদ হন অনেকে। এ শিল্পকর্মে শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রে দেখা যায় গুলিবিদ্ধ তরুণের আহত শরীর আঁকড়ে ধরে আছে আরেক তরুণ আন্দোলনকারী। আহত তরুণের হাতে রয়েছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-সংবলিত প্ল্যাকার্ড। সাদা-কালোর খোদাই এ চিত্রের দিকে

তাকালে আমরা যেন ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ফিরে যাই। শিল্পী মুর্তজা বশীর (২০১২: ৪) এ চিত্রটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:

> এই লিনোকাটের কম্পোজিশনে সেনাবাহিনী ও ছাত্র-জনতার মুখোমুখি অবস্থানকে তুলে ধরা ছিল মূল লক্ষ্য। সরাসরি সেনা না দেখিয়ে প্রতীকরূপে বেয়নেট লাগানো রাইফেল ও ব্রেনগানের নল এবং ছাত্র-জনতাকে বোঝানোর জন্য ভূলুণ্ঠিত খোলা বই-খাতা ও একজোড়া নগ্ন পায়ের পাতা চিত্রিত হয়েছে। এই মুখোমুখি ঘটনা যে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, তা বোঝানোর জন্য হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে অসম্পূর্ণভাবে আঁকা অক্ষরগুলো থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না আমাদের দাবি, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বাঙালির গর্বের ইতিহাস। ১৯৫২-র চেতনা আমাদের প্রতিপদে উজ্জীবিত করে, শক্তি যোগায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের। ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করি একুশকে, বুকে ধারণ করি একুশের চেতনা। *নবান্ন* নাটকের লেখক বিজন ভট্টাচার্য জয়নুলের দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো দেখে বলেছিলেন, 'থাকতো জয়নুল আবেদিনের তুলি, লেখনী ছুড়ে ফেলে দিতাম'। (সন্তোষ, ২০০৩: ৯)। বিজন ভট্টাচার্যের মতো আমরাও বলতে পারি মুর্তজা বশীরের নরুনের আঁচড়েই যেন দেখতে পাই বায়ান্নোর একুশকে।

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যেও তাদের অধিকার আদায়ের লড়াই চলতে থাকে; এর মধ্যে অন্যতম তেভাগা আন্দোলন। কৃষক সমাজে নীল বিদ্রোহের পর এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল সবচেয়ে বেশি। যদিও এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩০-এর দশকে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ববাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় ইলা মিত্রের নেতৃত্বে তেভাগার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইলা মিত্র ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুর এলাকার কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের সহধর্মিণী এবং তিনি নিজেও ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। ইলা মিত্রের নেতৃত্বের গুণাবলি ও সাংগঠনিক দক্ষতায় আন্দোলন বেগবান হলেও পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও প্রচণ্ড দমনপীড়নের ফলে এ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (মালেকা, ২০১৮: ১১)। তবে এ আন্দোলন পূর্ববঙ্গে জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে। (সিরাজুল, ২০১১: ১৫)। তেভাগার সংগ্রাম মূলত সমগ্র বাংলার কৃষক সমাজকে শ্রেণিসচেতন করে তোলে এবং একটি পর্যায়ে এসে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী, জমিদার-জোতদার বিরোধী, সার্বিক অর্থে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলার কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নেত্রী ইলা মিত্রকে নিয়েই মুর্তজা বশীর ১৯৫৪ সালে আঁকেন 'আগামী দিনের অপেক্ষায়' এবং ১৯৫৫ সালে আঁকেন 'আগামী দিনের অপেক্ষায় (২)'।

'আগামী দিনের অপেক্ষায় (২)' (চিত্র: ০২) চিত্রে হাসপাতালের বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ইলা মিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনে কুঁকড়ে গেছে তাঁর সমস্ত শরীর। এমন পাশবিক নির্যাতনের কারণ পুরোপুরি রাজনৈতিক। নাচোলের কৃষক আন্দোলন নিষ্ক্রিয় করতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার চরম দমননীতি চালায়। নাচোলে পুলিশি আক্রমণের সময় ছদ্মবেশে আত্মগোপনে যাওয়ার পথে ১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি পুলিশের হাতে বন্দি হন ইলা মিত্র। বন্দিদশায় ইলা মিত্রের ওপর চলে অবর্ণনীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। (মালেকা, ২০১৮: ১১)। পুলিশের কড়া পাহারায় হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় ইলা মিত্রকে দেখতে যান রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। পরবর্তীকালে গল্পে, লেখায়, স্কেচে ফুটে উঠেছে সে সময়ের চিত্র। 'গল্পকারের লেখনীতে, সাংবাদিকদের রিপোর্টে, শিল্পীর তুলিতে নির্বাক, দৃঢ়চেতা ইলা মিত্র বারবার সংগ্রামের প্রতীক হয়েই আমাদের চেতনায় ধ্বনিত করেন জীবনের জয়গান।' (মালেকা, ২০১৮: ১৩)। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইলা মিত্রকে নিয়ে লেখেন 'কেন বোন পারুল ডাকো রে' শীর্ষক কবিতা:

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভেঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার (মালেকা, ২০১৮: ৫৯)

মুর্তজা বশীরের এ চিত্রও যেন সে সময়ের এক জীবন্ত ইতিহাস। উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ইলা মিত্র— যাঁকে দ্বিমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফ্লাট বা সমতল রঙে আউট লাইন ড্রইংয়ে চিত্রটির রূপ দেওয়া হয়েছে, যা মুর্তজা বশীরের চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নারীমূর্তিটির ড্রইং রীতিবদ্ধ (stylized); গলার গড়ন বাংলার টেপা পুতুলের মতো। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের *নারীমুখ* (গোয়াশ, ১৯৫১), *পাইন্যার মা* (গোয়াশ, ১৯৫৩) শীর্ষক নারী চরিত্রের গলার গড়নও এমন প্রসারিত। তিনটি প্যানেলে বিভক্ত চিত্রটিতে রঙের বিভাজনে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আঙ্গিক নির্মাণে ভ্যানগঘের স্টাইলের সাথে সাদৃশ্যময় যেন এ চিত্রটি। চিত্রটিতে শ্বেতমূর্তির মতো ইলা মিত্রের চোখে-মুখে বিষণ্নতার ছোঁয়া। কিন্তু তবু তিনি সুন্দর আগামীর অপেক্ষার প্রহর গুনছেন যেন প্রতিনিয়ত। এ চিত্রে মুর্তজা বশীর কৃষকনেত্রী ইলা মিত্রকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষকদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষকসমাজের প্রতি অপরিসীম দরদ আর মমতার পরিচয় দিয়েছেন, কামনা করেছেন কৃষকদের সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। শিল্পী এ চিত্রে নারীনেত্রী ইলা মিত্রকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এবং তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনার বীজ সর্বপ্রাণে ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি, স্বৈরাচারী সামরিক শাসন তথা দুঃশাসন বাঙালিদের আন্দোলনের পথে ধাবিত করে এবং ১৯৬৯-এ সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান— যেন বহুবছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬৯-এর সেই উত্তাল সময়ে শিল্পী কালি-কলমে আঁকেন 'জননী ভূলুণ্ঠিত' (চিত্র: ০৩) শীর্ষক চিত্র। আনুভূমিক বিন্যাসের চিত্রটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের দলিলবিশেষ। যেখানে নির্যাতিত নারীদের উপস্থাপন করা হয়েছে নানা ভঙ্গিতে। ভূলুণ্ঠিত নারীর এক হাতে ধরা প্ল্যাকার্ড যেখানে লেখা রয়েছে— 'মানুষের মতো বাঁচতে চাই', অন্য হাতে রয়েছে ফুলের গুচ্ছ। এ ফুলের গুচ্ছ যেন সুন্দর জীবন প্রত্যাশার প্রতিরূপ। চিত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিক, যার হাতে রয়েছে মারণাস্ত্র; অন্য নারী উড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তির পায়রা। শুধু রেখার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে চিত্রটি। চিত্রের ড্রইংয়ে পশ্চিমা ধারা লক্ষ করা যায়। কমপ্যাক্ট (compact) কম্পোজিশনের এ চিত্রের নারীর মধ্য দিয়ে শিল্পী সমগ্র দেশমাতৃকাকে বুঝিয়েছেন এবং শত নির্যাতনের পরেও বাঙালির বিজয়ের বার্তা তুলে ধরেছেন। এ চিত্র সম্পর্কে শিল্পী বলেন— 'বাঙালি জাতির ওপর একাত্তরে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটনা ঘটবে তা হয়তো একজন শিল্পী হিসেবে দূরদর্শন করেছিলাম *জননী* ভূলুণ্ঠিত নামে ১৯৬৯ আঁকা এক স্কেচে।' (মুর্তজা, ২০১৪: ৭০)। শিল্পীর দূরদর্শিতার প্রমাণ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১-এ মার্চের অসহযোগের দিনগুলোতেও মুর্তজা বশীরের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে শিল্পী মুর্তজা বশীর পাকিস্তান তথ্য ও জাতীয় সম্প্রচার বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সে সময় আমি সচেতন শিল্পী হিসেবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।' (আতিউর, ১৯৯৮: ১১৮)। ১২ মার্চ ঢাকায় আর্টস কাউন্সিল গ্যালারিতে বিকেল ৪টায় চারু ও কারু শিল্পীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন। এ সভায় শহিদ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শিল্পী মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদে'র ব্যানারে ঢাকার শিল্পীসমাজ 'স্বাধীনতা' শব্দকে ধারণ করে রাজপথে বেরিয়ে আসেন, নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সফিউদ্দীন আহমদ, মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ। শিল্পী মুর্তজা বশীর বক্তৃতায় বলেন, 'জনগণের এই মুক্তিসংগ্রামের সময় কেউ ঘরে বসে থাকতে পারেন না। বাংলাদেশের এই স্বাধিকার সংগ্রামে দেশের বীর জনতা বুকের রক্ত দিয়ে মুক্তির বীজ বপন করেছেন,

এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে থাকলে চলবে না। শিল্পীরা জনগণেরই লোক।' (মুর্তজা, ২০১৪: ৫৯)। শিল্পী মুর্তজার এ লড়াকু মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর 'বিরুদ্ধতা' এবং 'পরাভূত দানব' চিত্রে (চিত্র: ০৪, ০৫)। শিল্পী এ চিত্রে পাকিস্তানি আগ্রাসনকে দানবরূপে কল্পনা করেছেন। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্র দুটি কালি-কলমে আঁকা। চিত্রদুটির ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু টোনাল লাইন দিয়ে চরিত্রগুলোকে স্পষ্টতর করা হয়েছে। 'বিরুদ্ধতা' চিত্রে দেখা যায়, কৃষক দম্পতির হাতে কাস্তে; তারা বল্লম নিয়ে ডাইনোসরকে প্রতিহত করার চেষ্টায় লিপ্ত। কিষানি বাম হাতে ধরে আছে বাংলা বর্ণমালার প্ল্যাকার্ড। 'পরাভূত দানব' চিত্রে দেখা যায়, শহিদ মিনারের পাদদেশে ধরাশায়ী হয়েছে দানব। শিল্পীর প্রথম চিত্রে কিষানির হাতে ধরে থাকা বাংলা বর্ণমালা সংবলিত প্ল্যাকার্ড আমাদের ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে নিয়ে যায় এবং মনে করিয়ে দেয় বাঙালির প্রচণ্ড প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কথা। দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যায়, শহিদ মিনারের পাদদেশে পরাভূত দানবকে। আমরা জানি, ১৯৫২ সলের ভাষা আন্দোলনের পর ভাষা শহীদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনার বাঙালির শক্তির প্রতীক, সকল অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রেরণার আধার। শহিদ মিনার বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্মারক এবং এ চেতনার বলেই বাঙালি দানবরূপী পাকিস্তানকে পরাজিত করবে সে প্রতীক্ষায় শিল্পী মুর্তজা বশীর। এ শিল্পকর্ম দুটি সম্পর্কে শিল্পী (২০১২: ৪) বলেন:

> একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে আমি... বেশ কয়েকটি ড্রইং করেছিলাম, যা সে সময় বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আঁকা দুটি উল্লেখযোগ্য। জহির রায়হান সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক *দ্য এক্সপ্রেস* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল— বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, তাই কিষান কিষানিকে আমি বাংলার গণমানুষের প্রতিনিধিরূপে চিত্রায়িত করেছিলাম। চেক লুঙ্গি পরিহিত কিষানের ডান হাত উঁচিয়ে ধরা বল্লম, বাঁ হাতে দানবসুলভ এক জন্তুকে প্রতিরোধ করে রয়েছে। কিষানির ডান হাতে কাস্তে এবং বাঁ হাত উঁচু করে ধরা বাংলা বর্ণমালার প্ল্যাকার্ড। অন্য ড্রয়িংটি ছাপা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের *সোনার হরিণ চাই* চটি পুস্তিকায়। এখানে দেখানো হয়েছিল সেই বীভৎস জন্তু শহীদ মিনারের পাদদেশে ভূলুণ্ঠিত। জন্তু হিসেবে আমি ডাইনোসরকে প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছিলাম। ডাইনোসর যদিও তৃণভোজী, কিন্তু তার বিশালাকার ভয়ংকর রূপকে পাকিস্তানি আগ্রাসনের রূপক হিসেবে চিত্রিত করেছিলাম।

চিত্রদুটি কতকটা অলংকরণচিত্রের মতো হলেও অন্তর্নিহিত বক্তব্যের গুণে এর শিল্প বা ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

শিল্পী ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ-১৯৭১' (চিত্র: ০৬) শিরোনামে কালি-কলমে বেশ কয়েকটি ড্রইং করেন, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ। কিছুটা প্রতীকী ধাঁচের এসব রেখাচিত্রে পাকিস্তানি শাসকদের ডাইনোসরের আদলে দানবরূপে কল্পনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি

নারীদের নির্যাতন করে দানবের মতো, তাদের অত্যাচারের প্রতিরূপ এ চিত্রগুলো। কয়েকটি চিত্রে শিল্পী বাঙালি নারীদের বিজয়ীরূপে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পী এ চিত্রগুলোতে মূলত বাঙালি নারীদের অসীম ত্যাগ, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। চিত্রগুলোর আঁকার রীতি কিছুটা জ্যামিতিক ধাঁচের, চিত্রের ড্রইং লাইনগুলো পুরোপুরি ফ্ল্যাট, লাইনের বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ছবিতে আলো-ছায়ার তারতম্য লক্ষ করা যায় না। তবে ছবিগুলোর কম্পোজিশনে শিল্পী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শিল্পী মুর্তজা ১৯৭৩ সালে এচিং মাধ্যমে আঁকেন 'বাংলাদেশ-১৯৭১' চিত্রটি (চিত্র: ০৭)। এ চিত্রে এক কন্যাশিশু বসে আছে ফুল হাতে নিয়ে তার মায়ের কোলে; আর মা হাঁটু গেড়ে বসে আছে ভূমিতলে এবং একটি হাত ভূমির ওপরে উত্থিত। সবুজ ও ব্রান্ট সিয়েনা (brunt sienna) রঙের মিশ্রণ দেখা যায় এ ছাপচিত্রে। এখানে সবুজ রং দিয়ে ভূমি বুঝানো হয়েছে। উলম্ব বিন্যাসের এ ছবির ওপরের দিকের দুপাশে বেশকিছু রেখা দেখা যায়, যা মূলত বিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষার্থেই দেওয়া হয়েছে। পিতৃহারা কন্যা এবং স্বামীহারা জায়ার ছবি অঙ্কিত হয়েছে এ চিত্রে। চিত্রে নারীর চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেছে। এ চিত্রে কন্যা তার শহিদ পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। এক পরিবারের মধ্য দিয়ে শিল্পী ১৯৭১-এর বাংলার হাজার পরিবারকেই প্রতীকীভাবে যেন উপস্থাপন করেছেন এ চিত্রের মাধ্যমে।

শিল্পী ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারের পেছন দেওয়ালে 'অক্ষয়বট' (আবুল মনসুর, ২০১৬: ৪৪৮) শীর্ষক মুর‍্যাল চিত্র করেন। নানাবর্ণের পোড়া ইট, পাথর ইত্যাদি অক্ষয় উপাদানে নির্মিত হয়েছে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ এ ম্যুরাল চিত্র। ১৩ ফুট উঁচু ও ৩২ ফুট চওড়া এ ম্যুরালচিত্রে রূপায়িত হয়েছে স্নেহময়ী এক মা আর তার শহিদ সন্তানদের অবয়ব। ম্যুরালটিতে সূর্য, তারকার উপস্থিতিতে শহিদ সন্তানদের বীরত্ব ও তেজস্বিতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মায়ের অঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে শহিদদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গঠনরীতি ও উপাদানের বৈচিত্র্যে এক অনন্য ম্যুরাল হিসেবে উল্লেখ করা যায় এটিকে। (চিত্র: ০৮)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদের প্রতি প্রচণ্ড আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায় শিল্পী মুর্তজা বশীরের আঁকা 'শহীদদের সমাধি-লিপি বা এপিটাফ' (চিত্র : ০৯) নামক চিত্রকর্মের মধ্যে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে শিল্পী মুর্তজা বশীর সপরিবারে চলে যান প্যারিসে। শিল্পী একদিন হঠাৎ বাসার সামনে নুড়ি পাথরের বিন্যাসে শুদ্ধ আর সরল রূপ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর মনে হয় যে, পাথরের এ শুদ্ধ রূপই হতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের এপিটাফ। পাশাপাশি শিল্পী এটাও ভাবেন যে, অনেক ট্রাইবাল সমাজে মৃতের সম্মানার্থে পাথর সাজাবার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ ধারণা থেকেই মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে শিল্পী পাথরের বিন্যাসকে বেছে নিয়েছেন। এ সময় শিল্পী 'এপিটাফ' শিরোনামে ১১টি ছবি

আঁকেন। পরে ১৯৭৩ সালে ৪টি এবং ১৯৭৬ সালে ২০টি সহ মোট ৩৫টি 'এপিটাফ' শিরোনামে চিত্র আঁকেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিল্পী মুর্তজা বশীরের 'এপিটাফ' সিরিজের চিত্রগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয় 'এপিটাফ ফর দ্যা মার্টায়ারস'। প্রদর্শনীতে 'বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের তাঁর একান্ত এক নিজস্ব ভঙ্গি' (নজরুল, ১৯৯৫: ১৪৪) দেখে চিত্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলমগীর কবীর লেখেন:

> এপিটাফ সিরিজে বশীর তাঁর স্বভাবসুলভ সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনী প্রতিভায় আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অমর করতে চেয়েছেন। পাথরের নুড়ির ফর্মে তিনি দেখতে পান মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি, যার সাহায্যে শহীদদের অকুতোভয় আত্মার স্থাপনা হয়েছে চিরন্তন ব্যঞ্জনায়। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বিষাদ নেই, বরং বিনম্র রঙের শান্ত সমাহিত সমাহারে শহীদদের আত্মত্যাগকে যেন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়েছে। এ-কেবল শোকপ্রকাশ নয়, আনন্দানুভূতির উচ্ছ্বাসও বটে। (হাসনাত, ২০০৪: ৩৯)

শিল্পীর এ চিত্রগুলোতে রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, তবে রঙের আধিক্য চোখে পড়ে না। এ চিত্রগুলোর পশ্চাৎভূমিতে সাদা রঙের আবহ চোখে পড়ে। সাদা রং একাধারে শোকের প্রতীক আবার পবিত্রতা, শুভ্রতা, শান্তির প্রতীক। 'এপিটাফ' সিরিজের চিত্রগুলোতে সাদা রঙের ব্যবহারে শহিদদের প্রতি যেমন শোক প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাদের পবিত্র আত্মার শান্তিও কামনা করা হয়েছে। সাদা রঙের ব্যবহারে নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে উঠেছে সঙ্গীতময়। "এপিটাফ' সিরিজের ছবি বশীরের হৃদয় উজাড় করে প্রাণের আকুতি নিয়ে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় তৈরি এক বিশাল অর্ঘ্য। বিষাদ ছাড়িয়ে রৌদ্র জ্যোৎস্নাময় উৎফুল্ল এক আনন্দলোকে যাত্রার সুর বেজে ওঠে নিরন্তর বেগে। মৃত্যু এখানে হয়েছে মহান ও গৌরবময়।" (হাসনাত, ২০০৪: ৩৯)। কবি শামসুর রাহমান শিল্পীর এ সিরিজের ছবিগুলোকে বলেছেন 'পাথরের কবিতা', 'আত্মাকে প্রসারিত করার মহাকাব্য'। (হাসনাত, ২০০৪: ৩৯)। 'এপিটাফ' সিরিজের ছবি সম্পর্কে স্বয়ং শিল্পী মুর্তজা বশীরের বক্তব্য হলো— 'শহীদরা মৃত নয়। তাঁরা অবিনশ্বর তাঁদের আত্মাহুতি বৃথা হয়নি। বিষণ্নতাকে অতিক্রম করে তাঁদের পবিত্র, শুদ্ধআত্মা আলোকবর্তিকার মতো উজ্জ্বল, যা পাথরের ভেতরে বিচ্ছুরিত হতে দেখা যাচ্ছে। শহীদদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এর চেয়ে আনন্দময়, শক্তিশালী আর বাঙ্ময় প্রতীক ভাবা যায় না।' (হাসনাত, ২০০৪: ৩৯)। আনুভূমিক বিন্যাসের 'এপিটাফ' সিরিজের চিত্রগুলোতে রং ও ফর্মের সুসমন্বয়ে নামকরণের যথার্থতা লাভ করেছে।

মুর্তজা বশীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে নির্মাণ করেন 'মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য' (চিত্র: ১০)। ব্রোঞ্জে নির্মিত এ ভাস্কর্যে দেখা যায়, পাখিদের ডানায় যুক্ত রয়েছে রঙিন পাথর। একটি ডানায় রয়েছে চারটি পাথর যা বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চারটি নীতিকে নির্দেশ করে। অপর ডানায় রয়েছে ছয়টি পাথর যা ঐতিহাসিক ছয় ছফার স্মৃতি বহন করে। আবার উভয় ডানায় রয়েছে একুশটি ছোট

রক্তদানার মতো ছোট পাথর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বহন করে। (বিদ্যুৎ, ২০০৩: ২০৫)। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলাসদৃশ ভিত্তির ওপর মূল ভাস্কর্যটি নির্মিত হয় ১৯৮৪-৮৫ সালে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে নির্মিত এ ভাস্কর্যটি অন্যান্য ভাস্কর্য থেকে স্বতন্ত্র এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুর্তজা বশীর একাধারে শিল্পী, কবি, গল্পকার, ওপনাস্যিক, চিত্রনাট্যকার, গবেষক, মুদ্রাবিশারদ ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিষিক্ত। প্রথম জীবনে রাজনীতির সাথে সক্রিয়তা থাকলেও, পরবর্তীকালে তা থেকে সরে আসেন; তবে আজীবন ছিলেন রাজনীতিসচেতন। জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবননির্ভর ছবি আঁকলেও পরবর্তীকালে আঁকতে থাকেন বিমূর্ত ধারার ছবি। তিনি কখনও ছবির একই বিষয় ও আঙ্গিকে স্থির থাকেননি, ফলে তাঁর শিল্পকর্ম বৈচিত্র্যময়। তবে তাঁর মতে, এসব ছবি পুরোপুরি বিমূর্ত নয় 'বিমূর্ত বাস্তববাদী'। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না কখনও, তিনি নিজেকে সামাজিক অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পী মনে করতেন। তাঁর নিজের ভাষায়— 'শিল্পের সামাজিক দায় মেনে নিয়ে আমার শিল্প নির্মিত হয়।' (মুর্তজা, ২০১৪: ৩৫)। শিল্পী বিশ্বাস করতেন, তাঁর সমস্ত ছবিই মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

মুর্তজা বশীরের শিল্পকর্মের আলোকচিত্রসমূহ

চিত্র: ০১। *রক্তাক্ত একুশে*, লিনোকাট, ১৯৫২

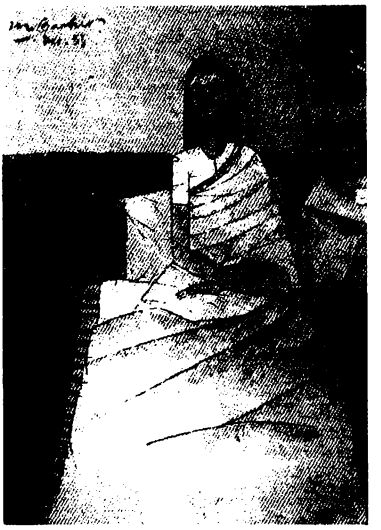

চিত্র: ০২। *আগামী দিনের অপেক্ষায় (২)*, তেলরং, ১৯৫৫

চিত্র: ০৩। *জননী ভূলুণ্ঠিত*, কালি-কলম, ১৯৬৯

চিত্র: ০৪। *বিরুদ্ধতা* (*Confrontation*), কালি-কলম, ১৯৭১

চিত্র: ০৫। *পরাভূত দানব*, কালি-কলম, ১৯৭১

চিত্র: ০৬। *বাংলাদেশ*-১৯৭১, (সিরিজ ড্রইং) কালি-কলম, ১৯৭২

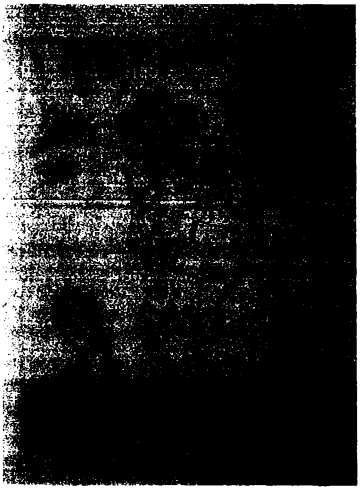

চিত্র: ০৭। *বাংলাদেশ* - ১৯৭১, এচিং, ১৯৭৩

চিত্র: ০৮। *অক্ষয়বট*, ম্যুরালচিত্র, ১৯৭৪

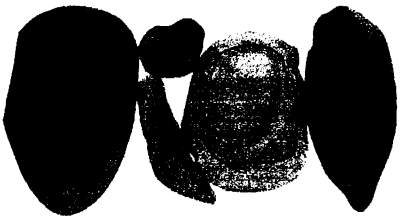

চিত্র: ০৯। *শহীদদের সমাধি-লিপি/ এপিটাফ* (সিরিজ চিত্র), তেলরং, ১৯৭৩-৭৬

চিত্র: ১০। *মুক্তিযুদ্ধের স্মারকভাস্কর্য*, ১৯৮৪-৮৫

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

ক. গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান, ২০১৩। *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিসাধক*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা।

আতিউর রহমান, ১৯৯৮। *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবুল মনসুর, ২০১৬। *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

কামরুল হাসান, ২০১০। 'আমার কথা : বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন', সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা : কামরুল হাসান*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

নজরুল ইসলাম, ১৯৯৫। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মুর্তজা বশীর, ২০১৪। *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা।

মাহমুদ আল জামান, ২০১৩। *জয়নুল, সফিউদ্দিন, কামরুল ও অন্যান্য*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

মতিউর রহমান, ২০১৪। *আকাশ ভরা সূর্যতারা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মালেকা বেগম, ২০১৮। *ইলা মিত্র : নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সন্তোষ গুপ্ত, ২০০৩। *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প : স্বরূপের সন্ধান*, মুক্তধারা, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ২০১১। *বাংলাপিডিয়া* ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

খ. প্রবন্ধ

ঢালী আল মামুন, ২০০৭। 'মুর্তজা বশীর', লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মুর্তজা বশীর, ২০১২। 'ভাষা আন্দোলনের চিত্রকর্ম', ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্রোড়পত্র, *প্রথম আলো*, ঢাকা পৃ. ৪।

মুর্তজা বশীর, ২০১৮। 'মানুষের মনে যখন রঙ নেই আমি তখন প্রজাপতির ডানা আঁকলাম', শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *উত্তরাধিকার* ৭৫তম সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, ২০০৩। 'বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য' (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : আই.বি.এস।

হাসনাত আবদুল হাই, ২০০৪। 'মুর্তজা বশীর : তাঁর জীবন ও সৃষ্টি', সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত *মুর্তজা বশীর*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।